73

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...11 FEB 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ... ৭ .....

অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ও কিছু কথা

নাজমুল হক

বলতে দ্বিধা নেই যে, বিগত কয়েক বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বেশকিছু ভিন্নধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি স্থাপিত হয়েছে অসংখ্য স্কুল ও কলেজ। শিক্ষা প্রশাসন, মন্ত্রণালয়, অধিদফতর, বোর্ড প্রভৃতি সিদ্ধান্ত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে গ্রহণ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পদ্ধতি, কম্পিউটারে ফল প্রকাশ, মেধার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং সাম্প্রতিককালে দেশের সকল বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত অন্যতম। উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিটিই যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নয়; কিছু কিছু এখনও রয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে।

অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রসঙ্গে দু'চার কথা উপস্থাপন করা যেতে পারে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা যেন প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে পরবর্তী স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমানভাবে ভর্তি হতে পারে— সেই 'আইডিয়া' থেকেই অভিন্ন প্রশ্নপত্রের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অবশ্য তিন দশক পূর্বে এদেশে একটিমাত্র শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে পরীক্ষা গৃহীত হয়ে এসেছে। সুতরাং বিষয়টি একেবারে অভূতপূর্ব নয়। তারপরও বর্তমান প্রজন্মের কাছে পদ্ধতিটি বিনা দ্বিধায় গৃহীত হয়নি। এটাই স্বাভাবিক। নতুন কোন কিছুই বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করানো বর্তমান সচেতন মানসিকতার যুগে আর বুঝি সম্ভব নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কর্তৃপক্ষ কোন্ পদ্ধতিতে, কিভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করবেন তা নিয়ে এসএসসি ও এইচএসসি (যে বয়সে নিজেদের ভালমন্দ সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব নয়) পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এত উত্তেজনা ও দুর্ভাবনা কেন? সর্বোপরি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে— এই উত্তেজনা ও অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় মূলত ঢাকা মহানগরী ও সুনির্দিষ্ট কয়েকটি শহরে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তাহলে আমরা বলতে পারি— এ ধরনের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সর্বজনীন নয়। আরও একটু খুলে বলা যায়— এই দুই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর বিক্ষোভ-ভাংচুরের অন্তরালে কাজ করে একটি বিশেষ মহলের উস্কানি-উত্তেজনা ও উদ্দেশ্য প্রণোদনা। বলাবাহুল্য, মহলটি শিক্ষা বিভাগেরই কোন না কোন অংশের সক্রিয় সদস্য।

তবে একটি কথা অবশ্যই বলতে হবে। শিক্ষাসংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও প্রবর্তনের পূর্বে বিষয়টি বার বার খতিয়ে দেখতে হবে, ভাবতে হবে। যেমন এসএসসি পর্যায়ের অবজেকটিভ প্রশ্ন প্রণয়নের বিষয়টি ছিল একটি ভাল সিদ্ধান্ত। কিন্তু 'প্রশ্ন ব্যাংকের' অন্তর্ভুক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনেনি। যার ফলে তড়িঘড়ি বিষয়টিকে কাটছাট করতে হয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপে শিক্ষাবিভাগের যেমন ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তেমনি বিব্রতও তারা কম হয়নি। বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার এমনিতেই কম। শিক্ষকদেরও গড় যোগ্যতা ও শিক্ষা প্রদান দক্ষতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে (বিশেষত গ্রামাঞ্চলে) কাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন নয়। প্রাসঙ্গিক না হলেও বলতে হয়— শিক্ষকতার পেশাকে অধিকাংশে শিক্ষক নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে কম মানসম্পন্ন মনে করেন। অন্যভাবে বলা যায়— "এত কষ্ট করে এত বড় ডিগ্রী অর্জন করে এভাবে ছাত্রছাত্রী ঠ্যাঙ্গাতে হবে— এজন্যই কি লেখাপড়া শিখলাম!" অনেকে শিক্ষকতায় আসেন একান্ত বাধ্য হয়ে। অন্য চাকরিতে ঠাঁই না পেয়ে অগত্যা স্কুল কলেজের অনাড়ম্বর। শিক্ষকতায় নাম লেখান। কিন্তু শিক্ষকতায় তো রোমান্স নেই, জাঁকজমক নেই, চার্ম নেই— পয়সাও সীমাবদ্ধ। অতএব বিকল্প পথে কিছু অতিরিক্ত রোজগার করতে এগিয়ে আসা। এ ধরনের 'দ্বিজাতিতত্ত্বে' অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকল্প পথটিই হয়ে ওঠে 'রাজপথ'। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে গতিশীলতা আসতে পারছে না। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এজন্য যে কেবল শিক্ষকগণই দায়ী তা কিন্তু নয়। অভিভাবকদের দায়বদ্ধতাও এ ব্যাপারে কম নয়। মহানগরী ও শহর বাদ দিলে বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ তাঁদের পোষ্যদের সার্টিফিকেট ও 'ডিভিশন' যতটা আশা করেন, গুণগত মান নিয়ে তাঁদের তত মাথা ব্যথা নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা নকল প্রবণতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। গ্রামাঞ্চলে এ অবস্থা সত্যিই ভয়াবহ। সেখানে যে কোন প্রকারেই হোক— পাস করাটাই একমাত্র লক্ষ্য।

প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করা হলে সারাদেশে একটি সমতা আসবে মেধার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। এই পদ্ধতিতে লোকসানের কোন কিছুই নেই। সুতরাং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তটি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। শিক্ষার্থীদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তবে একটি কথা বলতেই হয়— 'কলা' ও 'সমাজ বিজ্ঞান' বিষয়গুলোর মূল্যায়নের কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। যে শিক্ষক যেমন মনে করেন, নম্বর দেন সে রকমই। কম নম্বর পেলেও চ্যালেঞ্জ করার অবকাশ থাকে না। সাধারণত দেখা যায় ভাল স্কুল কলেজের পরীক্ষকগণ ভাল নম্বর দেন। সাধারণ স্কুল কলেজের শিক্ষকগণ নাকি ভাল নম্বর দিতে ইতস্তত করেন। কড়া পরীক্ষক বেশি নম্বর দেন না— তা যতই ভাল পরীক্ষা দিক না কেন। এই দিকগুলোও খতিয়ে দেখা দরকার। সমাধান হওয়া দরকার। একজন পরীক্ষার্থী কেন পরীক্ষকের মর্জি মেজাজের শিকার হবে?

পরিশেষে, কর্তৃপক্ষকে একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে— প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময় কেবলমাত্র সিলেবাসকেই অনুসরণ করতে হবে। কোন বিশেষ বোর্ডের পূর্বের প্রশ্ন বা পদ্ধতি অনুসরণ করা সঠিক হবে না। আমরা কামনা করি-শিক্ষকগণ পুরো সিলেবাস পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা পুরো সিলেবাস পড়বে। পরীক্ষক শিক্ষার্থীদের বয়সের কথা চিন্তা করে তাদের উপযোগী সরল প্রশ্ন করবেন। এই তিনের সমন্বয় এবং পরীক্ষার হলে সুষ্ঠু পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান যে পাওয়া যাবে— এতে কোন সন্দেহ নেই।